# ইউনিট ৭ চিনি ফসলের চাষ

ইউনিট ৭ চিনি ফসলের চাষ

চিনি (Sucrose) আমাদের নিকট অত্যন্ত  পরিচিত এজন্য যে, এটি একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য। চাউল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্যের তুলনায় মানুষ চিনি খুব কম পরিমাণে আহার করে। কারন, মানুষ চিনি সরাসরি গ্রহণ করে না। বিভিন্ন দ্রবসামগ্রী যেমন বেকারী শিল্প, মিষ্টান্ন, নানা রকম পানীয়, শিশু খাদ্য, চকলেট, রোগীর পথ্য, ঔষধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি শিল্পসহ নানা কাজে চিনি ব্যবহৃত হয়। চিনি মানবদেহে শক্তি যোগায় এবং শরীরে সহজে আত্মীয়করণ হয়ে যায় এজন্য এটি একটি অত্যন্ত  কার্যকরী খাদ্য উপকরণ। কিছু সংখ্যক চাষকৃত উদ্ভিদ থেকে বাণিজ্যিক ভাবে চিনি সংগ্রহ করা হয়। আখ, সুগার বীট, ভূট্টা ইত্যাদি চিনি উৎপাদকারী ফসলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি চিনি ফসলের পরিচিতি ও আখচাষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

এ ইউনিটের ৫টি তত্ত্বীয় পাঠে চিনি ফসলের পরিচিতি, বাংলাদেশের প্রধান চিনি ফসল আখের বিস্তারিত উৎপাদন পদ্ধতি, আখ কর্তন ও মাড়াই প্রভৃতি বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি ব্যবহারিক পাঠে আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ এবং জমিতে আখের বীজখন্ড রোপন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## পাঠ ৭.১ চিনি ফসলের পরিচিতি

### এ পাঠ শেষে আপনি

- চিনি কী এবং উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ থেকে চিনি পাওয়া যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পৃথিবীর প্রধান চিনি ফসলগুলোর নাম ও পরিচয় বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের চিনি ফসলগুলোর নাম ও উৎপাদনগত অবস্থান বর্ণনা করতে পারবেন।

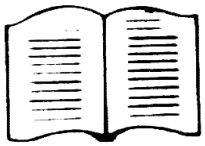

সমস্ত উদ্ভিদই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে গ্লুকোজ চিনি (Glucose) প্রস্তুত করে। কিন্তু প্রায় সকল উদ্ভিদই শ্বসনের মাধ্যমে সেই চিনি নিঃশেষ করে ফেলে। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা প্রস্তুতকৃত এই চিনিকে সুক্রোজ চিনি হিসেবে নিজ দেহের বিভিন্ন অংশে জমা করে রাখে। ফলে এ সকল উদ্ভিদ থেকে মানুষের খাবার উপযোগী চিনি সংগ্রহ করা যায়। বাণিজ্যিক-ভাবে চিনি সংগ্রহের সহজলভ্য উৎস হচ্ছে আখ, সুগার বীট, সাগো, ভূট্টা ইত্যাদি উদ্ভিদ। কাজেই মানুষের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য চিনি সরবরাহকারী এ সমস্ত উদ্ভিদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা আবশ্যক।

### চিনি উৎপাদনকরী ফসলসমুহের পরিচিতি

যে সমস্ত উদ্ভিদ থেকে চিনি সংগ্রহ করা হয় তাদেরকে চিনি উৎপাদনকারী ফসল বলে। চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলো তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে সুক্রোজ জমা করে রাখে। যেমন- আখ, খেজুর, সুগার, ম্যাপল, ভূট্টা, সরগম, সাগো প্রভৃতি উদ্ভিদ এদের কান্ডে চিনি জমা করে রাখে। এদের মধ্যে সাগো ব্যাতীত অন্যগুলোর ক্ষেত্রে কান্ডের কোষকলার ভিতর রস (Cell sap) হিসেবে চিনি বিদ্যমান থাকে। সাগোর ক্ষেত্রে পূর্নবয়স্ক গাছে পিথের (Pith) উপরিভাগে কান্ডাংশের মাঝে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি গ্রানিউল (Granule) আকারে দানাদার সুক্রোজ অবস্থান করে। সুগার বীট ও গাজরের মূলে সুক্রোজ থাকে। নারিকেল ও তাল গাছের ফুল থেকে সুক্রোজ পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু কিছু উদ্ভিদ তাদের ফলে সুক্রোজ সঞ্চয় করে রাখে। উলি-খিত উদ্ভিদগুলোর মধ্যে বিশ্বে চিনি উৎপাদনের বিবেচনায় আখ এবং সুগোর বীট হচ্ছে অন্যতম। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চিনির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আখ থেকে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ সুগার বীট থেকে উৎপন্ন হয় (দাস, ১৯৯৩)। নিম্নে বিশ্বের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর তালিকা দেওয়া হলোঃ

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চিনির প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ আখ থেকে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ সুগার বীট থেকে উৎপন্ন হয়।

টেবিল ৭.১ কঃ চিনি উৎপাদনকারী ফসলের তালিকা

| বাংলা নাম | বৈজ্ঞানিক নাম | পরিবার |
|---|---|---|
| আখ | *Saccharum officinarum* | Gramineae |
| সুগার বীট | *Beta vulgaris* | Chenopodiaceae |
| সুগার ম্যাপল | *Acer saccharum* | |
| ভূট্টা | *Zea mays* | Gramineae |
| সরগম | *Sorghum vulgare* | Gramineae |
| গাজর | *Daucus carota* | Umbelliferae |
| নারিকেল | *Cocos nucifera* | Palmaceae |
| খেজুর | *Phoneix sylvestris* | Palmaccae |
| তাল | *Caryota urens* | Palmaceae |
| সাগো | *Borassus flabellifer* | |
| | *Metroxylon sago* | Palmaceae |

### বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর পরিচিতি

আখই হচ্ছে বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, খেজুর ও তাল থেকে গুড় উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে সুগার বীট চাষের দু'একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হলেও ব্যাপক ভাবে এই ফসলটির চাষ এবং বাণিজ্যিকভাবে এটি থেকে চিনি উৎপাদন এখনো সম্ভব

প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয় এবং মোট আখ উৎপাদন প্রায় ৭০ লক্ষ টন।

হয়নি। আখ থেকে এদেশে মিল এলাকাতে চিনি তৈরি হলেও মিল এলাকার বাইরে প্রচুর পরিমাণে গুড় উৎপাদিত হয়। দেশের মোট আবাদি জমির মধ্যে আখের জমির পরিমান বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয় এবং মোট আখ উৎপাদন প্রায় ৭০ লক্ষ টন। দেশের ১৪ টি চিনি কলে প্রায় ১.৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হয়। যদিও এই উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এদেশে চিনি উৎপাদনকারী ফসলের মধ্যে আখের পরেই খেজুরের স্থান। খেজুর এখানে চাষ করা হয় না, প্রাকৃতিক ভাবেই জন্মায়। খেজুর থেকে গুড় উৎপাদন করা হয় এবং খেজুরের গুড় স্বাদে গন্ধে জনপ্রিয়। ১৯৮১-৮২ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে প্রায় ১০.৮ হাজার হেক্টর জমিতে ৩.৮ লক্ষ টন খেজুর রস উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে খেজুর গুড় উৎপাদকারী জেলাগুলোর মধ্যে কুষ্টিয়া, যশোহর ,রাজশাহী, ফরিদপুর, বরিশাল উল্লেখযোগ্য। শীতের প্রথম দিকে এ সকল অঞ্চলে খেজুরের রস একটি উপাদেয় পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তাল থেকেও কিছু পরিমাণ চিনি এদেশে তৈরি হয়। তবে তাল থেকে এখানে 'তাড়ি' নামক একটি মৃদু নেশাকর পানীয়ই বেশি তৈরি করা হয়। সামান্য কিছু রস দিয়ে তালমিশ্রি (চিনি) করা হয়। খেজুরের তুলনায় তালের আবাদি এলাকা অনেক কম, ২.০ হাজার হেক্টর মাত্র। ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত  পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তাল গাছের পুষ্প মঞ্জুরীতে টেপিং করে রস সংগ্রহ করা হয়। একটি তালগাছ থেকে এক মৌসুমে ৫-১০ মন রস সংগ্রহ করা যায় (কুদ্দুস,  ১৯৮৫)।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাণিজ্যিক চিনি বলতে কোন্ রাসায়নিক উপাদানটি বুঝানো হয় ?

(ক) গ্লুকোজ (খ) ফ্রুক্টোজ

(গ) সরবিটোল (ঘ) সুক্রোজ।

২। পৃথিবীর প্রধানতম চিনি ফসল কোন্‌টি?

(ক) বীট (খ) খেজুর

(গ) আখ (ঘ) ভুট্টা।

৩। নিচের কোন্ ফসলের ফুল থেকে চিনি সংগৃহীত হয়?

(ক) আখ (খ) তাল

(গ) গাজর (ঘ) সাগো।

৪। প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো চিনি ফসল কোন্‌টি?

(ক) আখ (খ) বীট

(গ) তাল (ঘ) ভুট্টা।

৫। খেজুর থেকে যে চিনি তৈরি হয় তাকে কী বলে?

(ক) চিনি (খ) গুড়

(গ) মিশ্রি (ঘ) মধু ।

## পাঠ ৭.২ আখের পরিচিতি ও গুরুত্ব

### এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের আখ ফসলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আখের প্রজাতি, শ্রেনী বিন্যাস এবং বাংলাদেশে অনুমোদিত জাতগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আখের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাটের পরেই আখের স্থান। তবে এদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষীদের কাছে আখ হচ্ছে প্রধান অর্থকরী ফসল। প্রতি বছর এদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপন্ন হয় সেটি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯২-৯৩ সালে বাংলাদেশে আখ চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ছিল ৪,৫৬,০০০ একর এবং উৎপাদন ছিল ৭৫,০৭,০০০ টন (বি.বি.এস., ১৯৯৪)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সুপারিশ অনুসারে জন প্রতি সুস্থ মানুষের বার্ষিক কমপক্ষে ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড়ের দরকার। অথচ এদেশে মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের মোট লভ্যতা ৬ কেজিরও কম (এফ. এ. ও., ১৯৯০)। তাই চিনি/গুড়ের ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রতি বছর ১.৫-১.৭ লক্ষ টন চিনি আমদানি করতে হয়। সুতরাং গুড় এবং চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য নুতন নুতন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আখের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কেননা, এদেশে হেক্টর প্রতি আখের গড় ফলন ৪২ টন এবং চিনি আহরণের শতকরা হার মাত্র ৮.০ ভাগ, যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন (আলী ও সহযোগীবৃন্দ, ১৯৮৯)। জাভায় আখের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮৯ টন এবং হাওয়াইয়ে ১৬০ টন। অথচ বিশেষজ্ঞগনের মতে বাংলাদেশে আবহাওয়া ও মাটি আখ চাষের জন্য খুবই উপযোগী (ইউয়ার্ট, ১৯৬৫)। কাজেই আখের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আখ সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ধারণা থাকতে হবে।

### আখের উৎপত্তি ও বিস্তার

আখের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। Barber (১৯৩১) এর মতে ভারতের উত্তরাঞ্চলে কাশ (*Saccharum spontaneum*) এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদ থেকে *S. sinensis* এবং *S. barberi* এর উদ্ভব হয়েছে যা একত্রে ভারতীয় আখ নামে পরিচিত। Brandes (১৯৫৬) এর মতে আদর্শ আখ (*S. officinarum*) এর উৎপত্তিস্থল হলো নিউগিনি, যেখানে অতি প্রাচীনকাল থেকেই লম্বা মোটা আখ জন্মে থাকে। আখ গ্রীস্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফসল বলে আখের চাষাবাদ পৃথিবীর ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিন অক্ষাংশ এলাকার আশে পাশে কেন্দ্রিভূত। বর্তমানে পৃথিবীর আখ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ভারত, কিউবা, ব্রাজিল,মেক্সিকো, পাকিস্তান, চায়না, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইন্ডিজ, এবং অস্ট্রেলিয়া।

আখ গ্রীস্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফসল বলে আখের চাষাবাদ পৃথিবীর ৩৫° উত্তর থেকে ৩৫° দক্ষিন অক্ষাংশ এলাকার আশে পাশে কেন্দ্রিভূত।

### উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি ও শ্রেনিবিন্যাস

আখ 'গ্রামিনী' পরিবারের অর্ন্তভূক্ত গাছ। এর দন্ডাকৃতি কান্ড (Culm) প্রায় ৯.৩ মিটার পর্যন্ লম্বা হতে পারে। সাধারণ আখ কান্ড উচ্চতায় ১.৮৫-৩.৭২ মিটার হয় (কুদ্দুস, ১৯৮৫)। কান্ডটি গোলাকার গীটযুক্ত, সুস্পষ্ট পর্বসন্ধি (Node) এবং পর্ব (Internode) এর সমন্বয়ে গঠিত। ম ল গুচ্ছাকৃতি, চারিদিকে ছড়ানো এবং অধিকাংশই ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে। পাতা ঘাসের মত, তরবারি আকৃতি, একান্ত রভাবে দুই সারিতে সাজানো, শুয়া (cilia) থাকে এবং পত্রখোল কচি অবস্থায় কান্ডকে বেষ্টন করে রাখে। কোন কোন আখের জাতে ফুল হয়। পুষ্পমুঞ্জুরীকে অৎৎড়ি বলে, যা সাদা কাশ ফুলের ন্যায়। প্রায় ৩০ সেমি বা তার চেয়েও লম্বা। বীজ কেরিওপ্সিস্ জাতীয়, কচি অবস্থায় সাদা এবং পরিপক্ক হলে বাদামি রং এর হয়।

আখ 'গ্রামিনী' পরিবারের অনার্তভূক্ত গাছ। এর দন্ডাকৃতি কান্ড (Culm) প্রায় ৯.৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। সাধারণ আখ কান্ড উচ্চতায় ১.৮৫-৩.৭২ মিটার হয় (কুদ্দস, ১৯৮৫)।

আখের জেনাস হচ্ছে *Saccharum,* যার অনেকগুলো প্রজাতি থাকলেও নিম্নলিখিত ৩টি আবাদযোগ্য প্রজাতির অন্যতমঃ

(ক) *S. officinarum*- মোটা, রসালো এবং ত্বক (Rind) কোমল বিধায় চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী। এই প্রজাতির আখের মধ্যে চিনির পরিমান বেশি এবং আঁশের পরিমান কম। এটি Smut রোগ প্রতিরোধী তবে লালপচা (Red rot) এবং মোজাইক রোগের প্রতি সংবেদনশীল। ট্রপিক্যাল অঞ্চলে এদের চাষ সীমাবদ্ধ।

(খ) *S. sinensis*- এই প্রজাতির আখ চিকন, লম্বা এবং চওড়া পাতাবিশিষ্ট। এতে চিনির পরিমাণ মাঝারি থেকে কম। এই আখ তাড়াতাড়ি পরিপক্কতা লাভ করে। এদের Internode গুলো বেশ লম্বা আঁকাবাঁকা প্রকৃতির এবং ঘড়ফব গুলো বেশ স্পষ্ট।

(গ) *S. barberi*- শীত প্রধান দেশের উপযোগী এই আখের কান্ড ছোট ও চিকন এবং পাতা অপেক্ষাকৃত সরু। চিনির পরিমাণ মাঝারি থেকে কম। এই আখে ছোবড়ার পরিমান বেশি তবে এটি তাড়াতাড়ি পরিপকতা লাভ করে।

**আখের জাত**

ঈযবরিহম ঃুঢ়ব এর মধ্যে অন্ততঃ চারটি গুরুত্বপূর্ণ জাত এদেশের প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে (১) ঢাকাই গ্যান্ডারী, (২) টেনারা, (৩) কাজলা এবং (৪) সুন্দরী।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে আখের চাষ হয়ে আসছে বিধায় এদেশের চাষীদের হাতে অনেকগুলো আখের জাত আছে। আখের এই জাতগুলোকে (ক) Chewing type এবং (খ) Commercial type হিসেবে প্রাথমিকভাবে ভাগ করা যায়। Chewing type এর মধ্যে অন্ততঃ চারটি গুরুত্বপূর্ণ জাত এদেশের প্রচলিত আছে। সেগুলো হচ্ছে (১) ঢাকাই গ্যান্ডারী, (২) টেনারা, (৩) কাজলা এবং (৪) সুন্দরী।

ব্যাপকভাবে আখ চাষের জন্য Commercial জাতগুলো ব্যবহৃত হয়। এই টাইপগুলো দুটি উৎস হতে এসেছে- (ক) আঞ্চলিক (Local) ও (খ) বিদেশী (Exotic)। অনেকগুলো আঞ্চলিক জাত কৃষকদের হাতে আছে , যদিও সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। লাল জাভা সি এবং নগরবাড়ী এই আখজাত দুটো উত্তরাঞ্চলে মিল এলাকায় আখ চাষীদের মাঝে বেশ সমাদৃত।

বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত Exotic আখগুলোর কথা বলতে গেলে বলা যায় যে, ভারত বিভক্তির পূর্বে ঢাকাতে Coimbatore Breeding Station এর একটি Sub-station ছিল। সেই হিসেবে ঢাকাতে বেশ কিছু Coimbatore (CO) আখজাত আসে, যার অনেকগুলোই এখনও বাংলাদেশে চাষের জন্য অনুমোদিত আছে। যেমন-

| | | |
|---|---|---|
| CO 975 | CO997 | CO527 |
| CO 1148 | CO421 | CO617 |
| CO 1158 | CO419 | CO636 |

এছাড়াও, ভারত বিভক্তির পূর্বে কিছু জাত আসে Bihar-Orrissa (BO), Quinsland (Q), Proost-Java (POJ), Ges Canal point (CP) থেকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো Q-69, BO-3, BO-17, BO-70, BO-71 ইত্যাদি।

অতঃপর ঈশ্বরদিতে বাংলাদেশ সুগারকেন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত (১৯৭৩) হবার পর এখানকার বিজ্ঞানীগন আখের নুতন নুতন জাত উদ্ভাবনসহ আখচাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এখান থেকে উদ্ভাবিত জাতগুলো সাধারণত ISD-, ঈশ্বরদি-, C- ইত্যাদি নামে পরিচিত। এই জাতগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এগুলো বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক চাষের জন্য, বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এবং অধিক ফলন ও অধিক হারে চিনি আহরণের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। ঈশ্বরদি আখ গবেষনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ ISD-1/53, ISD-2/54, ISD-5/55, ISD-9/57, ISD-16, ISD-17, ISD-18, ISD-19, ISD-20, ISD-21, লতারি জবা সি, ভি, এস- ৯৬ ইত্যাদি।

## আখের গুরুত্ব

আখ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথকরী ফসল। খরা ও বন্যাসহিষ্ণু বিধায় বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর চাষ কম ঝুঁকিপূর্ণ। দেশের উত্তরাঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকায় চাষীদের কাছে আখই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য আয়ের উৎস। দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনের উৎসই হচ্ছে আখ। এর ওপর ভিত্তি করেই দেশে চিনিকল ও চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। ফলতঃ আখচাষ ও চিনি শিল্পে এদেশে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। চিনিকলে আখ মাড়াই এর পর বাই-প্রোডাক্ট (উপজাত) হিসেবে যে ব্যাগাস (bagasse) পাওয়া যায় তা থেকে কাগজ ও ঝোলাগুড় তৈরি হয়। ঝোলাগুড় স্প্রিরিট ও এ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চিনি কলের প্রেস মাড (গাদ) একটি উত্তম জৈবসার। কুড়িটির বেশি শিল্পে পন্য আখের উপজাতদ্রব্য থেকে পাওয়া যায় (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)। আখের সবুজ পাতা গোখাদ্য এবং শুকনো পাতা জ্বালানি ও কুড়ে ঘরে ছাউনী হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আখ

আখ চাষের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে আখ চাষের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে সাথী ফসল হিসেবে অন্তত প্রায় ডজন খানেক শীত-কালীন ফসলের যে কোন একটি লাভ জনক ভাবে চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

চাষের আর একটি উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে আখ চাষের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে সাথী ফসল হিসেবে অন্তত প্রায় ডজন খানেক শীত-কালীন ফসলের যে কোন একটি লাভ জনক ভাবে চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

***অনুশীলন (Activity):*** *আখের Chewing type এবং Commercial type -এর জাতগুলোর পরিচিতি দিন।*

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

১। অর্থকরী ফসল হিসেবে বাংলাদেশে আখের স্থান কোথায়?

(ক) ২য় (খ) ৩ য়

(গ) ১ম (ঘ) ৪র্থ।

২। বাংলাদেশে আখের হেক্টর প্রতি গড় ফলন কত?

(ক) ৩২ টন (খ) ৪২ টন

(গ) ৬২ টন (ঘ) ৮২ টন।

৩। আখের উৎপত্তিস্থল কোন্ দুটি দেশের সাথে জড়িত?

(ক) ভারত-পাকিস্ ান (খ) ভারত-বাংলাদেশ

(গ) ভারত- আমেরিকা (ঘ) ভারত- নিউগিনি।

৪। নিম্নলিখিত কোন্ আখটি ট্রপিক্যাল অঞ্চলে চাষ করা হয়?

(ক) *S. sinensis* (খ) *S. officinarum*

(গ) *S. robusta* (ঘ) *S. barberi*

৫। নিম্নলিখিত আখের জাতগুলোর মধ্যে কোন্টি ঈযবরিহম ৠঢ়ব এর অন্ ভূর্ক্ত?

(ক) লাল জাভা সি (খ) BO-3

(গ) C- 16 (ঘ) কাজলা।

## পাঠ ৭.৩ আখ চাষের জন্য উপযুক্ত জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, আখ রোপনের সময় নির্ধারন

### এ পাঠে শেষে আপনি

- আখ চাষের জন্য যথাযথ জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- আখ চাষের জন্য জমি তৈরি করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে আখ রোপনের সময় উলে-খ করতে করবেন।

যে কোন ফসল চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি ও রোপনের সময় কৃষিতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং আখ চাষের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম নেই। আখ গুচ্ছমন্ডলী হলেও গভীরমন্ডলী ফসল এবং মাঠ ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলন দান করে থাকে। সে কারনে সাধারণাবেই বলা যায় আখফসল মাটি থেকে প্রচুর রস ও খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। আবার আখ খরা সহিষ্ণু হলেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারেনা। সুতরাং আখের জন্য মাটি নির্বাচন ও জমি তৈরি করার সময় এ সব বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্য দিকে, রোপন সময় আখের ফলনের ও চিনি আহরণের শতকরা হারের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

### জমি নির্বাচন

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫০ সেমি এর চেয়ে অধিক বিধায় সন্তোষজনক। তবে আখ অতি বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫০ সেমি এর চেয়ে অধিক বিধায় সন্তোষজনক। তবে আখ অতি বৃষ্টিপাত, বিশেষ করে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বৃষ্টি বা বন্যার পানি এক মাসের বেশি দাঁড়িয়ে থাকে এমন জমি আখচাষের উপযোগী নয়। উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি যেখানে বন্যার বা বৃষ্টির পানি দ্রুত নেমে যায় এমন জমি আখ চাষের উপযোগী। কিছু কিছু চর বা নিচু এলাকায় বন্যায় পানি দাঁড়িয়ে থাকে না তবে প্রবাহমান থাকে, সেখানে আখ চাষ করা সম্ভব হলেও আখের ক্ষেতে লাল পাতা ও উইল্ট রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। আখের জন্য সাধারণত ভারী মাটি (heavy soil) নির্বাচন করা হয়। দোআঁশ থেকে এঁটেল- দোআঁশ মাটিতে অত্যন্ সফলভাবে আখ চাষ করা যায়। কেবলমাত্র বেলে মাটি ছাড়া আর সব মাটিতেই আখ চাষ সম্ভব। তবে হালকা মাটি (light soils)-তে আখের চাষ করলে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ সংযোগ করার প্রয়োজন পড়ে। জমি নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিটি সমান (levelled) থাকে এবং একদিকে সামান্য ঢালু (elevated) হলে ভাল হয়। নদীর তীরবর্তী সুনিষ্কাশিত পলিপড়া জমিতে আখের ফলন অত্যন্ ভাল হয়। মাটির পি এইচ ৬.০-৮.০ এর মধ্যে থাকা দরকার। বাংলাদেশের গাঙ্গেয় পলিবাহিত মাটি আখ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

### জমি তৈরি

আখের শিকড় ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রচুর রস ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় শিকড় পার্শ্বে অবাধ বিস্তার লাভ করে। তাই আখের জমিতে গভীরভাবে চাষ এবং উত্তম কর্ষণ প্রয়োজন।

আখের শিকড় ২৫-৩০ সেমি মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং প্রচুর রস ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে বিধায় শিকড় পার্শ্বে অবাধ বিস্তার লাভ করে। তাই আখের জমিতে গভীরভাবে চাষ এবং উত্তম কর্ষণ প্রয়োজন।

উত্তম কর্ষণের জন্য জমি তৈরির সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায়ই ভিজা জমি চাষ করা উচিত নয়। জমিতে 'জো' আসলে চাষ শুরু করা বাঞ্চনীয়। আখের জমি কমপক্ষে ২০ সেমি গভীরতা পর্যন্ত চাষ করা প্রয়োজন যা দেশী লাঙ্গল দিয়ে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে জমি চাষ করা যেতে পারে (রহমান ও সাত্তার ১৯৯১)ঃ

* দেশী লাঙ্গল দিয়েঃ বাংলাদেশের প্রচলিত পদ্ধতি, তবে চাষের গভীরতা যথাযথ হয় না।
* কোদালের সাহায্যেঃ ব্যয় বহুল ও সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। লাঙ্গল চাষের পর প্রয়োজনীয় পরিখা তৈরি (Trench making)- করা যায়।
* মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল দিয়েঃ পশু চালিত উন্নত এ লাঙ্গল দিয়ে প্রায় ২০ সেমি গভীরতায় চাষ সম্ভব।

* ট্রাক্টর লাঙ্গল দিয়েঃ যথাযথ গভীরতায় চাষ (৩০ সেমি পর্যন্ত ) সম্ভব। বিশেষ করে বড় মাপের জমির জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বাংলাদেশে তিনটি পদ্ধতিতে আখ লাগানো (Planting) হয় - ১। সমতল জমির উপর বীচন লাগানো (Flat method of planting) ২। নালায় বীচন লাগানো (Furrow method of planting) এবং ৩। গভীর নালায় বীচন লাগানো (Trench method of planting)। কিন্তু যে পদ্ধতিতেই আখের চাষ করা হোক না কেন প্রাথমিক পর্যায়ের জমি প্রস্তুতি পর্ব একই মানের। জমির কর্ষিত অবস্থা হওয়া উচিত ছোট ছোট ঢিল ও গুঁড়া মাটির সংমিশ্রন। ঢিলগুলোর ব্যাস ৩ সেমি এর বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ক'টি চাষ দেওয়া প্রয়োজন তা নির্ভর করে মাটির ধরন, চাষের সময় মাটিতে রসের পরিমান ও আবহাওয়ার উপর (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)। বেলে দো-আঁশ মাটিতে দো-আঁশ মাটির চেয়ে চাষ কম লাগে। একটি আদর্শ জমি তৈরির জন্য ৫/৬ টি চাষ মই (গরু লাঙ্গল দিয়ে) প্রয়োজন হয়। চিনিকল সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাক্টর দ্বারা চাষ দিলে বেলে দো-আঁশ জমির জন্য ১টি চাষ (Mould board ploughing) ও ১টি মই (harrowing) এবং এটেল দো-আঁশ মাটির জন্য ১টি চাষ ও ২টি মইয়ের প্রয়োজন।

## আখের রোপনের সময় নির্ধারণ

আখ উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের ফসল বিধায় মোটামুটি উষ্ণ আবহাওয়া আখ চাষের উপযোগী। গাছের পরিপক্কতার জন্য বেশ কিছুটা তাপ এককের প্রয়োজন হয়। ফলে দেখা যায় শীত প্রধান অঞ্চলে আখ পরিপক্ক হতে দীর্ঘ সময় নেয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তাপমাত্রার সাথে আখের বৃদ্ধির সম্পর্ক নিচে দেখানো হল (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)ঃ

| $52^{\circ}$dv | $65^{\circ}$dv | $68^{\circ}$dv | $78^{\circ}$dv | $88^{\circ}$dv |
|---|---|---|---|---|
| চোখের ক্ষতি | বৃদ্ধি | বৃদ্ধি | সুষ্ঠু | বৃদ্ধি |
| (sub injury) | বন্ধ | শুরু | বৃদ্ধি | বন্ধ |

তাপমাত্রা ও আখের বৃদ্ধির উপরোক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী দেখা যায় যে, পৌষ মাস (১৫ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারী) ব্যতীত বাংলাদেশে অক্টোবর থেকে ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে আখের চারা রোপন (Planting of sett) করা যায়। পৌষের প্রচন্ড শীতে আখ রোপন করলে বীচনের চোখের ক্ষতি (Bud injury) হয়, আখ প্রায়শঃ গজায় না এবং বৃদ্ধি ব্যহত হয়। আখের এই দীর্ঘ রোপন সময় থাকলেও আগাম মৌসুমে রোপনের অংকুরোদগম হার, অঙ্গজ বৃদ্ধি , ফলন ও চিনি আহরণের শতকরা হার ইত্যাদি সবকিছু ভাল হয়। এছাড়াও আগাম আখ ফসলের সাথে শীতকালীন বিভিন্ন ফসল সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে।

পৌষ মাস (১৫ ডিসেম্বর- ১৫ জানুয়ারী) ব্যতীত বাংলাদেশে অক্টোবর থেকে ফ্রেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে আখের চারা রোপন (Planting of sett) করা যায়।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষনা ইনষ্টিটিউট যে রোপা আখ চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে তাতে দেখা যায় যে, এক চোখ বিশিষ্ট বেড চারা উৎপাদনের প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাস। ব্যাগ চারা (Polybag setling) উৎপাদনের সর্বোকৃষ্ট সময় আগষ্ট-সেপ্টেম্বর। এবং চারা লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় হচ্ছে মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর ( রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। মাঠ ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলন দেয় কোন্ ফসলটি?

(ক) আখ (খ) পাট

(গ) ধান (ঘ) গম

২। আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সমবন্টিত গড় বৃষ্টিপাত কত?

(ক) ১২০ সেমি (খ) ১৫০ সেমি

(গ) ১০০সেমি (ঘ) ২০০ সেমি।

৩। আখের জন্য কোন্ pH রেঞ্জ ভাল ?

(ক) ৪.০-৫.০ (খ) ৬.০-৮.০

(গ) ৭.০-৯.০ (ঘ) ৩.০-৫.০ ।

৪। আখ চাষের জন্য কী ধরনের কর্ষণ উপযোগী?

(ক) মধ্যম কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ (খ) হাল্কা কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ

(গ) উত্তম কর্ষণ ও মধ্যম গভীর কর্ষণ (ঘ) উত্তম কর্ষণ ও গভীর কর্ষণ ।

৫। আখের ব্যাগ চারা মূল জমিতে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট সময় কখন?

(ক) মধ্য অক্টোবর- মধ্য ডিসেম্বর (খ) মধ্য ডিসেম্বর - মধ্য জানুয়ারী

(গ) মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য ডিসেম্বর (ঘ) মধ্য নভেম্বর - মধ্য ডিসেম্বর।

## পাঠ ৭.৪ আখের জন্য সার প্রয়োগ এবং অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

**এ পাঠ শেষে আপনি**

- বাংলাদেশে আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমান উল্লেখ করতে পারবেন।
- জমিতে কখন ও কীভাবে সার দিতে হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আখ চাষের অন্তর্বর্তী পরিচর্যাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আখ মাটি থেকে অধিক মাত্রায় খাদ্যোপাদান শোষনকারী একটি ফসল। Singh (১৯৮৯) এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, হেক্টর প্রতি ৮০ টন আখ উৎপাদনের জন্য মাটি থেকে প্রায় ৯০-১১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮০ ৩০০ কেজি ফসফরিক অ্যাসিড, ৬০-১৮০ কেজি পটাশ এবং ৮০-৯০ কেজি ক্যালসিয়াম অপসারিত হয়ে থাকে। এই তথ্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য আখের জমিতে সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়। আবার সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা হলেও অন্যান্য অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা যদি যথাযথভাবে করা না হয়, তাহলেও আখের ফলন ও চিনি আহরণের শতকরা হার দুটোই মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। কাজেই, সাফল্যজনকভাবে আখ উৎপাদনের জন্যে আখের জমিতে সার প্রয়োগ এবং তার অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে ধারনা থাকা প্রয়োজন।

### সারের মাত্রা

বাংলাদেশের সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের কৃষি রসায়নবিদগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ দেশে আখের জন্য একর প্রতি ১০০-৬০-৪০ সের $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)। তবে তার প্রায় ৫০% দিতে হবে জৈবসার থেকে যেমন পচা গোবর/কম্পোষ্ট এবং খৈল থেকে। বাকি অর্ধেক রাসায়নিক সার থেকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

নিম্নে এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আখ চাষের জন্য সারের সুপারিশ প্রদান করা হলো (শামসুদ্দিন, ১৯৮৯)ঃ

টেবিল ৭.৪ কঃ সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের সুপারিশ অনুযায়ী আখচাষে সারের মাত্রা

| ক্রমিক নং | সার | খাদ্যোপাদান (সের/একর) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ঘ | চ২ঙ৫ | ক২ঙ |
| (ক) | গোবর মন/একর (০.৩৫-০.২৫-০.১৫%$N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$) | ২৮ | ২০ | ১২ |
| (খ) | সরিষার খৈল ( ৫.৫-২.৫-১.৫% $N\text{-}P_2O_5\text{-}K_2O$) | ২২ | ১০ | ০৬ |
| (গ) | ইউরিয়া- ১ মন ১৪ সের | ৫০ | - | - |
| *(ঘ) | টি এস পি- ৩২ সের | - | ৩০ | - |
| (ঙ) | এম পি- ২০ সের | - | - | ২২ |
| | মোট সার (সের/একর) | ১০০ - | ৬০ - | ৪০ |

* হাড়ের গুঁড়া (bone meal) পাওয়া গেলে ব্যবহার করা ভাল, তবে সেই অনুযায়ী টিএসপি সারের মাত্রা কম লাগবে।

ইউরিয়া ব্যতীত আর সব জৈব-অজৈব সার বীচন লাগানোর আগে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর ২ সপ্তাহ পর ১/৩ অংশ ইউরিয়া দিতে হবে এবং ইউরিয়া সারের বাকি অংশ সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ইউরিয়া ব্যতীত আর সব জৈব-অজৈব সার বীচন লাগানোর আগে ট্রেঞ্চে প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর ২ সপ্তাহ পর ১/৩ অংশ ইউরিয়া দিতে হবে এবং ইউরিয়া সারের বাকি অংশ সমান দুই কিস্তিতে ভাগ করে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (১৯৯১) আখ চাষে প্রায় ৫ প্রকার রাসায়নিক সার যথা ইউরিয়া, টিএসপি,এমপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। তারা প্রচলিত পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মাঝে সার প্রয়োগের মাত্রার সামান্যই

তারতম্য দেখিয়েছেন। অঞ্চল ভিত্তিক তাদের এই সারের অনুমোদিত মাত্রা নিম্নরূপ (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)ঃ

টেবিল ৭.৪ খঃ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (১৯৯১) কর্তৃক আখচাষে সুপারিশকৃত সারের মাত্রা

| মৃত্তিকা অঞ্চল | ইক্ষু উৎপাদন এলাকাসম হ | একর প্রতি সারের পরিমান (কেজি) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ইউরিয়া | টিএসপি | এমপি | জিপসাম | জিংক সালফেট |
| ১। পুরাতন হিমালয় এলাকার সমভূমি অঞ্চল | বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা | ১১২-১৫০ | ১১২ | ১৫০ | ৭৫ | - |
| ২। তিস্তা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল | বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল ও সিরাজগঞ্জ । | ১১২-১৫০ | ৭৫ | ১১২ | ৭৫ | - |
| ৩। বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার লালমাটি অঞ্চল। | বগুড়া, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার অংশ বিশেষ। | ১১২-১৫০ | ১১২ | ১১২ | ৭৫ | - |
| ৪। গংগাবিধৌত সমভূমি অঞ্চল । | বৃহত্তর রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোহর, পাবনা এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ। | ১১২-১৫০ | ১১২ | ১১২ | - | ১৪ |

* ইউরিয়ার দুটি মাত্রার মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে আখ চাষের জন্য ১১২ কেজি এবং রোপা আখ চাষের জন্য ১৫০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। নাবি আখের ক্ষেতে ১১২ কেজি মাত্র ইউরিয়া দিতে হবে।

## সার প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতির বেলায় $^{১}/_{২}$ ইউরিয়া, $^{১}/_{২}$ এমপি এবং সমস্ত টিএসপি সার বীচন লাগানোর সময় নালায় প্রয়োগ করতে হবে। বীচন লাগানোর আগে রোপনের জন্য তৈরি নালায় সারগুলো একত্রে মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং হালকা করে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম ও জিংক সালফেট জমি তৈরির শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে দুই কিস্তিতে কুশী বের হওয়াকালীন সময়ে (আখ লাগানোর ৪ মাসের মধ্যে) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপা আখ চাষের বেলায় জিপসাম ও জিংক সালফেট আগের মত জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত টিএসপি এবং $^{১}/_{৩}$ এমপি সার চারা রোপনের পূর্বে নালার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। রোপনের দুই সপ্তাহ পর চারার চারদিকের মাটিতে $^{১}/_{৩}$ ইউরিয়া স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের সময় চারার গোড়ার মাটি নিড়ানী বা খুরপি দিয়ে আলগা করে দিলে ভাল হয়। অবশিষ্ট ২/৩ ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দুই ভাগে ভাগ করে দুই কিস্তিতে কুশি বের হওয়াকালীন সময়ে উপরি

প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ৩/৪ টি কুশি বের হলে এবং দ্বিতীয় কিস্তি কুশি গজানের শেষ পর্যায়ে (চৈত্র-বৈশাখ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে।

## অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বীজ লাগানোর পর থেকে ফসল কাটার আগ পর্যন্ত ফসল গাছের যত্ন নেবার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হয় সেগুলোকে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা বলে। আখের ক্ষেত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং সময়মত প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করা ভাল ফসল তথা উচ্চ ফলনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আখের অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সমূহ নিম্নরূপ ঃ

### ক) শুন্যস্থান পূরণ (Gap filling)

জমিতে আখের বীজ/চারা রোপনের পর কোন কোন স্থানে বীজের সন্তোষজনক অংকুরোদগম হয় না অথবা রোপা চারা মারা যায়। কাজেই এ সকল স্থানে সুস্থ সবল চারা রোপন করা আবশ্যক। এ কাজটি চারা রোপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা ভাল। চারাগুলো সমবয়সী এবং একই জাতের হতে হবে। মাটিতে যদি রস না থাকে তা হলে জীবনী সেচ (Live irrigation) দিতে হবে নতুবা বৃষ্টির পর গ্যাপ ফিলিং করতে হবে।

### খ) মাটি আলগাকরন

আখের শিকড় মাটির বেশ গভীরে প্রবেশ করে বিধায় গাছ পর্যাপ্ত পরিমানে পানি এবং খাদ্যোপাদান গ্রহন করতে পারে। তাই আখ চাষের জন্য নরম এবং ঝুরঝুরা মাটি প্রয়োজন যার অভ্যন্তরে অনায়াসে বাতাস প্রবেশ ও চলাচল করতে পারে। ভারী বৃষ্টিপাত অথবা সেচের পর জমির উপরিভাবে মাটি বেশ শক্ত হয়ে আখের শিকড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে গাছ পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যোপাদান নিতে পারে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই আখের ফলন অনেক কমে যায়। তাই বৃষ্টি অথবা সেচের পর পর আখের জমিতে মাটি আলগা করে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঝুরঝুরে মাটি চারার গোড়ায় পড়ে নালা ভর্তি হয়ে না যায়। চারার গোড়ায় বেশী মাটি চাপা পড়ে গেলে কুশির উৎপাদন কমে যায় এবং বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

### গ) আগাছা দমন

আগাছার প্রকোপ অনুসারে আখের জমিতে বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে ৩-৪ বার আগাছা দমন করা আবশ্যক এবং আগাছা দমনের উপযুক্ত সময় সাধারণত আগাছার বৃদ্ধি, জমির অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্ধারণ করা ভাল। তবে আখের জমিতে সাধারণত মাটি আলগাকরণ এবং আগাছা দমন একসাথে করা যেতে পারে।

আখ গাছের গোড়ায় সাধারণত দুবার মাটি তুলে দেওয়া দরকার। প্রথমবার কুশি বের হওয়া শেষ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবারের প্রায় একমাস পর আখের গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

### ঘ) আখের গোড়ায় মাটি দেওয়া (Earthing up)

আখ গাছের গোড়ায় সাধারণত দুবার মাটি তুলে দেওয়া দরকার। প্রথমবার কুশি বের হওয়া শেষ এবং দ্বিতীয়বার প্রথমবারের প্রায় একমাস পর আখের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। আখের গোড়ায় মাটি দেবার উদ্দেশ্য হলো-

- ঝড় বাতাস যাতে গাছের ক্ষতি করতে না পারে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুশি যাতে বের হতে না পারে।
- বৃষ্টিপাতের কারণে জমিতে পানি জমে গেলেও যেন আখের গোড়া কিছুটা জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পায়।

**ঙ) শুকনা পাতা পরিষ্কারকরণ**

আখের পাতা শুকিয়ে যাওয়ার পর তা ঝরে না পড়ে গাছের সাথেই থেকে যায়। যে কারণে আখের শুকনো পাতা পরিষ্কার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তপরিচর্যা। কারণ এ শুকনো পাতা যদি গাছে থেকে যায় তা হলে আখ চাষকে বিভিন্ন ভাবে ব্যহত করে। যেমন-

- শুকনো পাতায় আখের বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকামাকড় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সুস্থ গাছকে আক্রমণ করে।
- পাতার খোল এবং পর্বের সংযোগস্থলে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। ফলে উক্ত পর্ব থেকে নতুন কুঁড়ি অংকুরিত হয় যা আখের চিনির পরিমান কমিয়ে দেয়।
- গাছে শুকনো পাতা থাকলে সে গাছ বাতাসে হেলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কাজেই আখ চাষের সময় পাতা শুকিয়ে যাওয়া শুরু হবার পর থেকেই ধারালো কাঁচি দ্বারা এ সমস্ত শুকনা পাতা কেটে পরিষ্করা করা প্রয়োজন।

**চ) আখ বেঁধে দেওয়া**

আখ চাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গাছকে খাড়া অবস্থায় রাখা কেননা গাছ যদি হেলে পড়ে তাহলে-

- কান্ডের বৃদ্ধি কমে যায়।
- পার্শ্বকুশি গজায়।
- আখের ওজন হ্রাস পায় এবং চিনির পরিমাণ কমে যায়।
- কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ মরে যায়।
- বীজ হিসেবে আখের গুণাগুণ কমে যায়।

কাজেই আখ গাছ যাতে হেলে পড়তে না পারে সেজন্য হেলে পড়ার সম্ভবনা দেখা দেওয়া মাত্রই গাছ বেধে দিতে হবে। এজন্য প্রথমেই প্রতিটি ঝাড় শুকনো ও অর্ধশুকনো আখের পাতা দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বাধতে হবে। পরবর্তীতে পাশাপাশি দুসারির ৩/৪ টি ঝাড় আবার একত্রে বেঁধে দিতে হবে। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আখের ডগাগুলো পরস্পরের সাথে জড়িয়ে না যায়। আখের গাছ এভাবে পাতা দিয়ে জড়িয়ে দিলে শিয়ালের আক্রমনও কম হয়।

**ছ) ঠেস দেওয়া**

আখের গাছ বেধে দেওয়া হলেও যে সমস্ত এলাকায় বেশ ঝড় হয় সেখানে গাছ হেলে পড়ে যাবার বেশি সম্ভবনা থাকে। তাই ঐ সমস্ত এলাকায় আখের গাছকে হেলে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্যে বাঁশের সাহায্যে ঠেস দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

**চ) সেচ ও পানি নিকাশ**

উত্তম ফলনের জন্য আখের জমিতে সেচ প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। কেননা, আখ হচ্ছে একটি দীর্ঘজীবী ফসল এবং দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো কখনো অনাবৃষ্টির কারণে জমির রস কমে যায়। ফলে আখের বৃদ্ধিসহ পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য কমে যায় । তাই আখের জমিতে বীজ বপন এবং চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকালীন সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সময়ে যদি জমিতে রস শুকিয়ে যায় তা হলে সময়মত সেচ দিতে হবে ।

জলাবদ্ধতায় আখের ফলন এবং চিনির পরিমাণ কমে যায় বলে বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময়মত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

পক্ষান্তরে, জলাবদ্ধতায় আখের ফলন এবং চিনির পরিমাণ কমে যায় বলে বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সময়মত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। আখ ক্ষেতের ভিতরে ও চারিদিকে গভীর নালা কেটে পানি নিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

**ঞ) রোগ এবং কীটপতংগ দমন**

আখে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন- লাল পচা, নেতিয়ে পড়া, ক্লোরোসিস, লাল রেখা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন পোকামাকড় যেমন- উইপোকা, ডগার মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সময়মত উপযুক্ত পদ্ধতিতে এ সব রোগ এবং পোকা মাকড় দমন করা আবশ্যক।

***অনুশীলন (Activity) :*** *আখ চাষে অন্তর্বর্তী পরিচর্যাসমূহ এবং এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।*

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। আখগাছ মাটি থেকে সবচেয়ে বেশি কোন খাদ্যোপদান গ্রহণ করে ?

ক) নাইট্রোজেন খ) ফসফরাস

গ) পটাশ ঘ) সালফার।

২। আখ চাষে নিম্নলিখিত কোন খাদ্যোপাদন সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করতে হয় ?

ক) নাইট্রোজেন খ) ফসফরাস

গ) পটাশ ঘ) সালফার।

৩। নিম্নলিখিত কোন অঞ্চলে জিংক সার ব্যবহার করা প্রয়োজন ?

ক) পুরাতন হিমালয় সমভূমি অঞ্চল খ) গংগাবিধৌত সমভুমি অঞ্চল

গ) তিস্তা-যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রবিধৌত সমভূমি অঞ্চল ঘ) বরেন্দ্র ও মধুপুর এলাকার পলিমাটি অঞ্চল।

৪। আখচাষে নিম্নলিখিত কোন্ সার দুটির উপরি প্রয়োগ করতে হয় ?

ক) ইউরিয়া ও টিএসপি খ) ইউরিয়া ও এমপি

গ) ইউরিয়া ও জিপসাম ঘ) ইউরিয়া ও জিংক সার ।

৫। আখ গাছের শুকনো পাতা নিম্নলিখিত কোন্ কারণের জন্য পরিস্কার করা হয় ?

ক) ক্ষেতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খ) মরা পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য

গ) মরা পাতা গাছ থেকে যাতে খাদ্য না নিতে পারে

ঘ) পর্বের পোড়ায় পানি জমে যে শিকড় সৃষ্টি হতে পারে তা বন্ধের জন্য।

## পাঠ ৭.৫ আখ কর্তন ও মাড়াই

**এ পাঠ শেষে আপনি**

- আখ কাটার সময়ের সাথে ফলনের সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন।
- আখের পরিপক্কতার লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আখ মাড়াই এর পর কীভাবে চিনি ও গুড় উৎপাদন হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

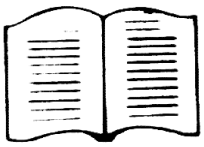

আখের ফলন ও তার গুনগত মান সঠিক সময়ে এবং সঠিক ভাবে আখ কাটার উপর নির্ভর করে। কেননা, উপযুক্ত বয়সের পূর্বে আখ কাটা হলে পরিপক্কতা কম থাকার কারণে আখে চিনির পরিমাণ কম হয়। অন্যদিকে, উপযুক্ত বয়সের পরে আখ কাটলে গাছে জমাকৃত চিনি বিয়োজিত হয়ে যায় বলে এতেও চিনির পরিমাণ কমে যায়। আবার আখ মাড়াই পদ্ধতির উপরও চিনি আহরণের হার নির্ভর করে। যেমন- কিউবাতে যেখানে মিলে চিনি আহরণের হার ১৭-১৮%, আমাদের দেশে চিনিকলগুলোতে এ হার মাত্র ৭-৮% (কুদ্দুস, ১৯৯৫), কাজেই এমতবস্থায় আখের উচ্চ ফলন এবং তা থেকে সার্থকভাবে চিনি উৎপাদনের জন্যে আখ কাটা ও মাড়াই সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

### আখ কর্তন

বাংলাদেশে আখ কাটার মৌসুম বেশ বিস্তীর্ণ—মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে শুর€ হয়ে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চাষীরা চড়াদামে আখ বিক্রয় করার জন্য সেপ্টেম্বরের আগেও কিছু কিছু আখ কাটা শুরু করে। আখ কাটার সময় হয়েছে কিনা তা বাহ্যিকভাবে দেখে তেমন একটা বুঝা যায় না। তবে মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিত লক্ষণসমুহ দেখা গেলে বুঝতে হবে যে আখ পরিপক্ক হয়েছে-

- কোন একটি আখ কেটে সমান তিন খন্ডে বিভক্ত করে চিবিয়ে খেতে সব খন্ডই প্রায় সমান মিষ্টি মনে হ'লে।
- গাছের বয়স ১২-১৪ মাস হলে।
- কান্ডের বৃদ্ধি কমে গেলে এবং উপরের দিকের পর্বমধ্য ছোট হয়ে আসলে।
- আখের কান্ডের দু মাথা ধরে বাকালে যদি মাঝখানে মট করে ভেঙে যায়।
- পাতা আকারে ছোট এবং হলুদ হয়ে আসলে।
- আখের কান্ডে ছুরি বা কাস্তে দ্বারা আঘাত করলে যদি ধাতব পদার্থের ন্যায় শব্দ হয়।

পরিপক্ক আখে কঠিন পদার্থের পরিমান (যা Brix নামে পরিচিত) ২০-২২% এবং সুক্রোজের পরিমাণ কঠিন পদার্থের ৮৫-৯৫% হবে (গাফ্ফার, ১৯৮৯)।

তবে আখে চিনির পরিমাণই আখের পরিপক্কতা এবং আখ কাটার সঠিক সময় নির্ধারণের মাপকাঠি। পরীক্ষাগারে রিফ্রাক্টোমিটার (Refractometer) নামক যন্ত্রের সাহায্যে আখের পরিপক্কতা নির্ধারণ করা যায় । সাধারণত কান্ডের উপরের পরিপক্ক অংশ থেকে রস সংগ্রহ করে উপরোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রসে মোট কঠিন পদার্থের পরিমান নির্ধারণ করা হয়। পরিপক্ক আখে কঠিন পদার্থের পরিমান (যা Brix নামে পরিচিত) ২০-২২% এবং সুক্রোজের পরিমাণ কঠিন পদার্থের ৮৫-৯৫% হবে (গাফ্ফার, ১৯৮৯)।

আখের পরিপক্কতা নির্ধারণ করার পর ধারালো কোদাল দিয়ে মাটির সমতলে অথবা সম্ভব হলে মাটির একটু গভীরেই আখের গোড়া কেটে নেওয়া উচিত। কোন সময়েই দা বা হাসুয়া দিয়ে আখ কাটা উচিত নয়। কেননা, এতে আখের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) মাটিতে থেকে যায়।

### আখ মাড়াই

আখ কাটার পর মাড়াই যোগ্য আখ থেকে চিনি বা গুড় উৎপাদন করা যায়। চিনি উৎপাদন করার

জন্যে আখকে চিনি কলে এবং গুড় উৎপাদন করার জন্যে আখকে হস্ত চালিত/বলদ চালিত/বিদ্যুৎ চালিত মাড়াই কলে মাড়াই করা হয়। আমাদের দেশে উৎপাদিত আখের শতকরা প্রায় ৫০ভাগ গুড়

তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচে চিনি ও গুড় তৈরি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো (রহমান ও সাত্তার, ১৯৯১)।

**ক) আখ থেকে চিনি তৈরি**

চিনি তৈরি করার জন্যে আখ কাটার পর এগুলোকে পাতা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার করে চিনিকলে নেওয়া হয় এবং চিনিকলের ঘ র্নায়মান ছুরির মাধ্যমে কেটে ছোট ছোট টুকরায় পরিনত করা হয়। এ টুকরাগুলোকে প্রেষণ যন্ত্রের সাহায্যে পিষে রস বের করা হয় এবং ছাকনির সাহায্যে রসে বিদ্যমান অপদ্রব্য দূর করা হয়। এ অবস্থায় আখের রস কিছুটা ম্লস্বাদযুক্ত থাকে এবং রসে দ্রবনীয় কিছু অপদ্রব্য থেকে যায় যা দ র করার জন্যে রসের সাথে গন্ধক, চুন ও টিএসপি সার যোগ করা হয়। তারপর সিরাপ টাওয়ারে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা এবং চাপে পরিষ্কার রস তাপ দিয়ে ঘন করা হয় এবং কড়াইতে (Pan) জ্বাল দিয়ে আরো ঘন করা হয়। এর ফলে 'মিসিকিউট' নামক চিনির দানা ও ঝোলা গুড়ের মিশ্রণ পাওয়া যায় যাকে পরবর্তীতে সেন্ট্রিফিউজ করে চিনির দানা আলাদা করে নেওয়া হয়।

**খ) আখ থেকে গুড় তৈর**

আখের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থই গুড় হিসাবে পরিচিত।

আখের শোধিত বা অশোধিত রস থেকে উৎপাদিত ঘনীভূত তরল বা কঠিন পদার্থই গুড় হিসাবে পরিচিত। গুড়ের গুণগতমান আখের রসের মিশ্রন, রস জ্বাল দেওয়ার পদ্ধতি এবং ব্যবহৃত পরিষ্কারকের ধরনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত আখ থেকে গুড় উৎপাদন তিনটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়-

- রস নিষ্কাশন
- রস ঘনীভূতকরণ
- রস পরিষ্কারকরণ

*রস নিষ্কাশন*

এর মাধ্যমে মোট রসের শতকরা মাত্র ৪৫-৫০ ভাগ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক তিন রোলার বিশিষ্ট হস্ত বা গরু-মহিষ চালিত মাড়াই যন্ে র সাহায্যে আখ পিষে রস নিষ্কাশন করে থাকে। এর মাধ্যমে মোট রসের শতকরা মাত্র ৪৫-৫০ ভাগ নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। তবে কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যুৎ চালিত মাড়াই কলের সাহায্যেও আখের রস নিষ্কাশন করা হয় যেখানে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ রস নিষ্কাশন করা সম্ভব।

*রস পরিষ্কারকরণ*

আখ থেকে রস নিষ্কাশন করার পর তা থেকে যতদ র সম্ভব অনাকাংখিত ও অনভিপ্রেত দ্রব্যসমূহ অপসারন করার জন্য এবং রস ফুটানোর সময় অচিনিজাত দ্রব্যসম হের সমাহার বন্ধ করার জন্য রস পরিষ্কার করা হয়। রস পরিষ্কার করার জন্যে সাধারণত জৈব ও অজৈব ধরনের পরিষ্কারক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জৈব পরিষ্কারকসমুহ যেমন-ঢেঁড়স গাছের কান্ডের নিাংশের সবুজ অংশসহ শিকড় গুঁড়ো পানিতে মিশিয়ে বিজল ও বর্ণহীন পদার্থ (১.২৫ কেজি কান্ড শিকড় চূর্ণ + ২০ লিটার পানি) তৈরি হয় এবং সেটি ফুটন্ত আখের রসের সাথে মিশিয়ে রস পরিষ্কার করা যেতে পারে। এছাড়া, মান্দার ও শিম ল গাছের বাকল পানিতে কচলিয়ে কিংবা রেড়ি ও চীনাবাদামের বীজ গুঁড়া করে পানিতে কচলিয়ে যে তরল পদার্থ পাওয়া যায় তাও জৈব পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন অজৈব পরিষ্কারক সম হের মধ্যে চুনের পানি, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, হাইড্রোজ, ফিটকিরি ইত্যাদি উলে-খ্যযোগ্য।

বিভিন্ন অজৈব পরিষ্কারক সম হের মধ্যে চুনের পানি, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, হাইড্রোজ, ফিটকিরি ইত্যাদি উলে-খ্যযোগ্য। তবে আমাদের দেশে গুড় প্রস্তুত অঞ্চলে সাধারণত হাইড্রোজের ব্যবহার ব্যাপক। এর ব্যবহারে গুড়ের রং উজ্জল হয়। অজৈব ও জৈব

পরিষ্কারসম হের মধ্যে জৈব পরিষ্কারক ভাল হলেও এর প্রাপ্যতা ও খরচের নিরীখে অজৈব পরিষ্কারকসম হ আমাদের দেশে ইদানিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

***রস ঘনীভূতকরণ***

রস পরিষ্কার করার পর এটি কিছুটা ম্লস্বাদ যুক্ত থাকে বলে এতে কিছুটা চুন মিশিয়ে রস নিরপেক্ষ করা হয়। এছাড়া, চুন মিশানোর ফলে আখের রসে দ্রুত তলানী পড়ে বিধায় বর্জ্য পদার্থসম হ সহজেই গাদ হিসাবে পৃথক করা যায়। তারপর রসকে ১১০-১১৫° সে. তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঘন সিরাপ তৈরি করা হয়। এ অবস্থায় রসের ঝলকানো সিরাপ ফেটে যাওয়া এবং কড়াইয়ে লেগে যাওয়া রোধ করার জন্য সিরাপের সাথে সামান্য নারিকেল তেল মিশানো হয় এবং সিরাপকে ঘন ঘন নাড়তে হয়। ঘনীভূত সিরাপের অবস্থা যদি এমন হয় যে, এটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না, আবার কাঁচের ন্যায় শক্ত দানাও হয় না তখন সিরাপ ভর্তি কড়াই চূলা থেকে নামিয়ে কাঠের হাতলের সাহায্যে সিরাপকে ঘন ঘন নেড়ে তা ঠান্ডা করতে হয়। ঠান্ডা হওয়ার পর ঘণীভূত এ সিরাপ কাংক্ষিত আকারের মাটির বা কাঠের পাত্রে ঢেলে আরও ঠান্ডা করা হয়। তারপর এটি ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেলে গুড় হিসাবে বাজারজাত করা হয়।

আখ, রস ও গুড়ের অনুপাত মোটামুটি ১০০ঃ৬০ঃ১০।

আখ, রস ও গুড়ের অনুপাত মোটামুটি ১০০ঃ৬০ঃ১০। অর্থাৎ ১০০কেজি আখ থেকে ৬০ লি. রস ও ১০কেজি. গুড় পাওয়া যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাংলাদেশের মিলের চিনি আহরনের শতকরা হার কত ?

(ক) ৫-৬%　　(খ) ১৫-১৮%

(গ) ১২-১৫%　　(ঘ) ৭-%৮।

২। রিফ্র্যাক্টোমিটারের সুক্রোজের কোন্ রিডিংটির সাথে আখ পরিপক্কতার লক্ষণ সামঞ্জস্যপ র্ণ থাকতে পারে ?

(ক) ৫০-৬৫%　　(খ) ৭০-৮৫%

(গ) ৪০-৫৫%　　(ঘ) ৮০-৯৫%।

৩। চিনির দানা ও গুড়ের মিশ্রণ থেকে কিভাবে চিনি আলাদা করা হয় ?

(ক) সেন্ট্রিফিউজ করে　　(খ) পরিষ্কারক মিশিয়ে

(গ) প্রেষণ যন্ত্র দিয়ে　　(ঘ) ঘনীভূত করে।

৪। গরু-মহিষ চালিত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে শতকরা কতভাগ রস নিষ্কাশন করা যায় ?

(ক) ৩০-৪০ ভাগ　　(খ) ৪০-৫০ ভাগ

(গ) ৫০-৫৫ ভাগ　　(ঘ) ৬০-৬৫ ভাগ।

৫। নিম্নলিখিত কোন অজৈব পরিষ্কারকটি বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) চুনের পানি　　(খ) হাইড্রোজ

(গ) ফিটকিরি　　(ঘ) সোডিয়াম কার্বনেট।

1| চিনি কী? এটি কীভাবে উদ্ভিদ দেহে থাকে তা বুঝিয়ে বলুন।

2| পৃথিবীতে প্রধান দুটি চিনি ফসল কী কী? নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবারসহ ৭ টি চিনি ফসলের উল্লেখ করুন।

3| বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনকারী ফসলগুলোর ওপর একটি সমীক্ষা লিখুন।

4| আখের উৎপত্তিস্থল বর্ননা করুন এবং কোন্ কোন্ দেশে আখ উৎপন্ন হয় লিখুন।

5| আখের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচয় দিন এবং আখের প্রজাতিগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

6| বাংলাদেশে প্রচলিত আখের জাতগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

7| বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আখের গুরুত্ব বর্ননা করুন।

8| আখ চাষের জন্য কী ধরনের জমি নির্বাচন করবেন?

9| আখ চাষের জন্য কীভাবে জমি তৈরি করবেন?

10| তাপমাত্রা ও আখের বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক রেখে বাংলাদেশে কখন আখ রোপন করতে হবে?

11| আখের জমিতে সার দেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে লিখুন।

12| আখ চাষের জন্য বাংলাদেশ সয়েল ফার্টিলিটি সার্ভের 'ফার্টিলাইজার প্রোগ্রাম' ব্যাখ্যাসহ লিখুন।

13| বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী আখচাষে সারের প্রয়োগমাত্রা লিখুন।

14| প্রচলিত পদ্ধতি ও রোপা আখচাষ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের নিয়মাবলী বুঝিয়ে লিখুন।

15| আখের প্রধান অন্তবর্তী পরিচর্যা কী কী ? ধান বা গম চাষে ব্যবহার হয়না অথচ আখচাষে প্রয়োজন এমন দুটি বিশেষ অন্ বর্তী পরিচর্যা বর্ণনা করুন।

16| আখ পরিপক্ক হবার আগে বা পরে কাটলে কী ক্ষতি হয় ?

17| আখ পরিপক্কতার লক্ষণ কী কী ? এদেশে আখ কাটার মৌসুম কোন্টি এবং কীভাবে আখ কাটা উচিত ?

18| আখ থেকে কীভাবে চিনি তৈরি হয় তা বুঝিয়ে বলুন।

19| আখ থেকে গুড় তৈরির ধাপ কী কী ? ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

20| গুড়ের রং উজ্জ্বল করার জন্য জৈব ও অজৈব পরিষ্কারকের ব্যবহার বুঝিয়ে বলুন।

**উত্তরমালা**

পাঠ ১

১। ঘ ২। গ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। খ

পাঠ ২

১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। ঘ, ৫। খ

পাঠ ৩

১। ক, ২। খ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। গ

পাঠ ৪

১। খ,  ২। ক,  ৩। খ,  ৪। খ,  ৫। ঘ,

পাঠ ৫

১। ঘ,  ২। ঘ,  ৩। ক,  ৪। খ,  ৫। খ

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- কিভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করা হয় তা উলে-খ করতে পরবেন।
- আখ চাষের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বীজ আখ সংগ্রহ ও আখ রোপন কিভাবে হাতে-কলমে করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে আখের ফলন ও চিনি আহরনের শতকরা হার পৃথিবীর মধ্যেসর্ব নিম্ন। আলী এবং তার সহযোগীদের (১৯৮৯) মতে প্রচলিত পদ্ধতিতে যথাযথ অঙ্কুরোদগম না হবার ফলে জমিতে শতকরা ৩১ ভাগ স্থান ফাঁকা (Gap) থেকে যায়। এর ফলে মাড়াই যোগ্য (Millable) আখ কম উৎপাদন হয় এবং ফলন কমে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণ এ দেশে আখের ফলন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করে থাকেন তার মধ্যে অন্যতম হলো-

- আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ
- আখ চাষে রোপা পদ্ধতি অনুসরণ।

## আধুনিক পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহ

ভাল অঙ্কুরোদ্গম, গাছের বৃদ্ধি ও উচ্চ ফলন নিশ্চিত করার জন্য সুস্থ, সবল এবং রোগ ও পোকা-মাকড়মুক্ত আখ বীজ ব্যবহার করুন। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো উন্নত পদ্ধতিতে বীজ আখ সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্টঃ

ক) বীজ আখের চাষ- আখের বীজ নির্বাচনের কাজ বীজ সংগ্রহের প্রায় এক বছর আগেই শুর€ হয়। যথাযথ যত্ন ও পরিচর্যার মাধ্যমে বীজ চাষ কর€ন, যেখান থেকে পরবর্তীতে আখ বীজ সংগ্রহ করা হয়। এভাবে আবাদকৃত প্রত্যায়িত আখ বীজ ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করাই বিজ্ঞানসম্মত।

খ) প্রি ফার্টিলাইজড্ বীজ আখ - বীজ আখ কাটার ৪-৬ সপ্তাহ আগে বীজ আখের জমিতে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫-৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে পারবেন। বীজ আখকে জোরালো ও সতেজ রাখাই এই বাড়তি সার প্রয়োগের কাজ। প্রি ফার্টলাইজড্ বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। চারার শিকড় দ্রুত গজায় এবং চারার বৃদ্ধি জোরালো হয়। সার দেবার আগে মাটিতে যেন রস থাকে সেটি নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে সেচ দিয়ে সার প্রয়োগ করতে পারবেন।

গ) বীজ আখ নির্বাচন- বীজের জন্য আলাদাভাবে উৎপাদিত আখের জমি থেকে আখ বীজ সংগ্রহ কর€ন। পোকামাকড় ও রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না। বীজ আখ গাছের বয়স ৮-৯ মাস হলে ভাল হয়। গাছের যে অংশে শিকড় থাকে তা বীজের জন্য বাদ দিন। সম্ভব হলে নীচের ১/৩ অংশ বাদ দিয়ে আখ বীজ সংগ্রহ করুন। কারণ, নিচের ১/৩ অংশে চিনির ভাগ বেশি থাকে ও চোখগুলো শক্ত থাকে বলে ভাল গজায় না।

গ) বীচন তৈরি- ক্ষেত হতে আখ কাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যে 'দা' বা 'হাসুয়া' ব্যবহার করা হবে তাকে আগুনে ঝলসিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন। উত্তপ্ত দা/হাসুয়ার গায়ে ২/৩ ফোটা পানি দিলে যদি সাথে সাথে শব্দ করে শুকিয়ে যায় তাহলে অস্ত্র জীবাণুমুক্ত হয়েছে মনে করতে হবে। এছাড়া ৫% 'লাইসল' দ্রবনে দা/হাসুয়া ডুবিয়ে নিয়েও জীবাণুমুক্ত করা যায়।

আখ গাছ যদি বহন করে দুরের জমিতে নিতে হয় তাহলে শুকনো পাতা গাছের গায়ে লেগে থাকা অবস্থায় করুন। এতে আখের চোখ কম নষ্ট হয়। এরপর আখকে একটি উঁচু খুটির উপর রেখে দা/হাসুয়ার সাহায্যে সাজোরে সামান্য কাত করে কাটুন যেম কোন অবস্থাতেই কান্ড থেৎলে বা ফেটে না যায়। এই ছোট ছোট টুকরোই আখের বীচন যা এক/দুই বা তিন চোখবিশিষ্ট হতে পারে। চোখ

বলতে আখের গীট (Node) কে বুঝায়। এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের বেলায় চোখের উপরের দিকে ২.৫ সেমি ও নীচের দিকে ৫-৭.৫ সেমি. কান্ড রেখে কাটুন। বীচন কাটার সময় নজর রাখুন যাতে আখের চোখ উপরে বা পাশে থাকে অর্থাৎ যেন আঘাত না পায়। এছাড়া, আখ গাছটি খন্ড করার সময় তা উপর থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নিচের দিকে কাটুন। এক, দুই ও তিন চোখ বিশিষ্ট কাটা আখের বীচনের ছবি নিম্নে দেখানো হলো (চিত্র ৭.৬ ক)ঃ

**ছবি**

ঘ) বীচন শোধন- মাটি বাহিত রোগজীবাণু থেকে আখকে রক্ষা করার জন্য রোপণের আগে বীচনকে শোধন করুন। বীচনগুলোকে ০.১% এরিটান দ্রবনে ১০ মিনিট ডুবিয়ে নিলেই চলে। এছাড়া, টেক্টো বা ব্যাভিষ্টিন নামক ছত্রাক নাশক দ্বারা বীচন শোধন করতে পারবেন।

## জমিতে বীজ আখ রোপন

প্রচলিত পদ্ধতি এবং রোপা পদ্ধতি- এই দুই ভাবেই বাংলাদেশে বর্তমানে আখ চাষ করা হয়ে থাকে।

উন্নত হওয়া সত্বেও রোপা পদ্ধতির বিস্ ার আমাদের দেশে এখনো তেমন একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। নিম্নে এ পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি (Flat method)
২। ভাওড় পদ্ধতি (Ridge method)
৩। নালা পদ্ধতি (Trench method)

খ) রোপা পদ্ধতি ।

## ক) প্রচলিত পদ্ধতি

১। সমতলী পদ্ধতি- বীজ আখ রোপন করার পরও জমি সমতল দেখায় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা ৫-৬ সেমি নালা তৈরি করা হয়। তারপর নালায় বীজ আখ রোপন করে ৫-৬ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

২। ভাওড় পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে সমতলী পদ্ধতির চেয়ে কিছুটা গভীর নালা (প্রায় ১৫ সেমি) তৈরি করার পর নালায় বীজ আখ স্থাপন করে ৮-১০ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

৩। নালা পদ্ধতি- প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নালা পদ্ধতি উত্তম বলে বর্তমানে বাংলাদেশে নালা পদ্ধতিতে অধিকাংশ কৃষক চাষ করে থাকে। এ পদ্ধতিতে ৩০ সেমি গভীর নালা এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে নালার উপরের দিকে প্রায় ৪০ সেমি এবং নিচের দিকে প্রায় ৩০ সেমি চওড়া থাকে। তারপর নালার নিচের দিকে ৫-৭ সেমি.স্থান খুঁড়ে নরম করে বীজ আখ রোপন করা হয় এবং বীজ আখ ৫-৭ সেমি মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। এক নালার কেন্দ্রবিন্দু থেকে অন্যটির কেন্দ্রবিন্দু ৯০-১০০ সেমি দুরত্ব হয় (চিত্রঃ ৭.৬ খ)।

## খ) রোপা পদ্ধতি

বাংলাদেশে ১৯৬৯ সনে প্রথম রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট ১৯৭৬ সালে এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয় যে, নিম্মোক্ত দুটি কারণে বাংলাদেশে রোপা আখের চাষ প্রচলিত আখচাষের চেয়ে বেশি সম্ভবনাময়-

- প্রচলিত আখচাষ পদ্ধতিতে যেখানে একর প্রতি বীজের পরিমাণ ১.৮৭ টন, রোপা পদ্ধতিতে বীজ লাগে মাত্র ০.৪৫ টন।
- প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে রোপা পদ্ধতিতে আখ এবং চিনি উভয় ক্ষেত্রেই ফলন বেশি পাওয়া যায়।

এছাড়া, ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ এম শাহজাহান ১৯৮১ সালে উল্লেখ করেন যে, চিনিকল এলাকার ১.৯০ লক্ষ একর জমিতে রোপা আখ চাষ করা হলে ১২.২৫ কোটি টাকা

মূল্যের বীজ আখের আশ্রয় হবে। এই  পরিমাণ আখ মিলে সরবরাহ করলে ২৪২০৭ টন অতিরিক্ত চিনি উৎপাদিত হবে (Ali ***et al***., ১৯৮৯) ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে আখ চাষের ক্ষেত্রে রোপা পদ্ধতি বা Spaced Transplanting (STP) একটি অত্যন্ত  সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। নিম্নে এ পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

রোপা আখ চাষকে চারা উৎপাদন পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত দুভাগে ভাগ করা যায়-

১. সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি
২. পলিব্যাগ পদ্ধতি

### সাধারণ বীজতলা পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজন মোতাবেক ৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট যে কোন দৈর্ঘ্যের বীজতলা তৈরি করতে পারবেন। তবে আন্ত পরিচর্যা ও চলাফেরার সুবিধার্থে ৪ × ২৪ ফুট বীজতলা তৈরি করা ভাল। বীজতলার মাটি ভালভাবে চাষ করে ও কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে নিন। বীজতলার মাটিতে ২ মন পচা গোবর/ কম্পোষ্ট, ৮ ছটাক ইউরিয়া, ৮ ছটাক টিএসপি এবং ৪ ছটাক এমপি প্রয়োগ করে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। তারপর দুই চোখ বিশিষ্ট বীজখন্ডের চোখ পাশে রেখে মাটির সমান্তরালে পাশাপাশি স্থাপন করে বীজ খন্ডগুলোকে প্রায় ১ সেমি মাটির স্তর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বীজ খন্ডগুলো সামান্য দেখা যায়। বীজতলাটি খড় অথবা আখের শুকনা পাতা দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষার্থে মাঝে মধ্যে সেচ দিন। এভাবে উৎপন্ন চারা ৪ পাতা বিশিষ্ট হলেই তুলে নিয়ে ম ল জমিতে ৬-৯ ইঞ্চি গভীর নালায় রোপন করে ১-১.৫ ইঞ্চি মাটি দ্বারা ঢেকে দিন (চিত্র: ৭.৬ গ)।

### পলিব্যাগ পদ্ধতি

পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা না থাকলে পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে রোপা আখ চাষ করা উত্তম। এক্ষেত্রে প্রথমে ৫ × ৪ ইঞ্চি মাপের পলিথিন ব্যাগ নিয়ে ব্যাগের ৩/৪ অংশ ৫০ ভাগ বেলে দোঁআশ মাটি এবং ৫০ ভাগ গোবর বা কম্পোস্ট এর মিশ্রন দিয়ে পুরণ কর€ন। এরপর এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ডের চোখ উপরের দিকে রেখে খাড়া করে ব্যাগের মাটির মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন কর€ন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ ব্যাগের উপর থেকে আধ ইঞ্চি নিচে থাকে। ব্যাগটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে মাটি একটু চেপে দিন। তবে এ সময় লক্ষ্য রাখুন যেন বীজ খন্ডের অগ্রভাগ মাটির বাইরে বেরিয়ে না থাকে। ব্যাগের নিচের দিকে ১/২ টি ছিদ্র করে দিন যেন বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি ব্যাগে জমে না থাকে।

ব্যাগসম হ আঙ্গিনায় বা সুবিধাযুক্ত অন্য কোথাও সারিবদ্ধভাবে রেখে কিছু খড় বা আখের শুকনা পাতা দ্বারা ঢেকে দিন। উৎপন্ন চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে এগুলো রোপন উপযোগী হয়। রোপন করার পূর্বেই অর্ধেক অংশ অবশ্যই ছেটে দিন। রোপন করার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে পলিব্যাগগুলো পানি ভর্তি বালতিতে চুবিয়ে নিন। ব্লেডের সাহায্যে পলিব্যাগগুলো কেটে মাটিসহ চারা ব্যাগ থেকে আলাদা করে জমিতে গর্ত করে রোপন করুন।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

**অ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্নঃ**

১। আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে বীজ আখ সংগ্রহ করবেন ?

২। নালা পদ্ধতি ও রোপা আখ চাষ পদ্ধতির মধ্যে তূলনাম লক সুবিধা-অসুবিধা কী কী ?

৩। সাধারণ বীজতলা পদ্ধতিতে কিভাবে রোপনের জন্য চারা তৈরি করবেন ?

৪। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে আখের চারা তৈরির বর্ণনা দিন।

আ. বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তর নির্দ্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত কর€ন

১। আখের উচ্চ ফলনের জন্য নিম্নলিখিত কোন্ বিষয়টি অগ্রগণ্য ?

ক) আখ গাছের উচ্চতা
খ) উৎপন্ন আখের কান্ডের ব্যাস
গ) আখ কাটার সময়
ঘ) হেক্টর প্রতি মাড়াইযোগ্য আখের সংখ্যা।

২। বীজের গুণগত মানের জন্য আখ গাছের কোন্ অংশটি বেশি গ্রহনযোগ্য ?

ক) নীচের ১/৩ অংশ
খ) উপরের ১/৩ অংশ
গ) মাঝের ১/৩ অংশ
ঘ) সমগ্র গাছটি।

৩। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে কোন্ ধরনের বীজখন্ড ব্যবহার করা হয় ?

ক) এক চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড
খ) দুই চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড
গ) তিন চোখ বিশিষ্ট আখখন্ড
ঘ) গোটা আখ গাছখন্ড।

৪। কোন্ পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আখচাষ হয় ?

ক) পলিব্যাগ পদ্ধতি
খ) ভাওড় পদ্ধতি।
গ) নালা পদ্ধতি
ঘ) সমতলী পদ্ধতি

৫। পলিব্যাগ পদ্ধতিতে উৎপন্ন চারা কখন রোপন উপযোগী হয় ?

ক) চারা ৬ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন হলে
খ) চারা চার পাতাবিশিষ্ট হলে
গ) চারা ১২ ইঞ্চি উচ্চতাসম্পন্ন হলে
ঘ) চারা দুই পাতাবিশিষ্ট হলে।

**সঠিক উত্তরঃ** আ. ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। খ